আশৈশব একুশ

মখদুম আজম মাশরাফী

বুঝতে শেখা থেকেই একুশের সাথে আমার পরিচয়। বারো পার্বণ তেরো পূজায় যেমন গ্রাম দেশে সাজ সাজ পড়ে যায় তেমনি একুশ ছিল বাৎসরিক সাড়া জাগানো স্বরন দিন। ফেব্রুয়ারীর আগের মাস থেকেই একুশের প্রভাত ফেরীর জন্য গানের রিহার্সাল শুরু হতো। মাদুর বিছিয়ে হারমনিয়াম নিয়ে বসে পড়তেন আমাদের সোবহানদা। আমরা সবাই কণ্ঠ মেলাতাম। নানান গানের প্রাকটিস চলতো। কিছু গান চিরচেনা আর অন্য গুলি নিজেদের লেখা।

আগের রাতে ফুল যোগাড় করে আনতাম। আমাদের ডোমারে মাড়োয়াড়িদের অনেক ধান পাটের আড়ত আছে। ওদের অনেক বড় জায়গা নিয়ে আড়ত। পরিপাটি ফুলের বাগান গুলি প্রায় সব গুলিই ওদের। একুশের জন্য ওরা খুশী মনে আমাদের বাগান থেকে ফুল নিতে দিত। ওদের গৃহ ভাষা যদিও বাংলা নয় তবুও একুশ ছিল আমাদের সবার প্রানের বিষয়।

একুশের ভোরে আঁধার থাকতেই জেগে ওঠা। সাদা কাপড় পরা। বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তোলা। অগ্রজেরা কিনে নিয়ে আসতেন কালো কাপড়। তা থেকে রাতেই তৈরি করা হতো কালো ব্যাজ। আমাদের সবার জামায় বুকের ওপর অথবা বাহুতে আলপিন দিয়ে আটকিয়ে দিতেন তারা। মেয়েরাও ওদের দল নিয়ে সে ভাবেই এসে যোগ দিত আমাদের সাথে।কালো পতাকা হাতে হাতে নেয়া। ভাব গম্ভীর এক পরিবেশ তৈরি হওয়া। তারপর খালি পায়ে ভোরের শিশির মাখা ধূলির পথ ধরে শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা শুরু হতো। সোবহানদার গলায় গামছা দিয়ে ঝুলানো হারমোনিয়ামে সেই চির চেনা গানের সাথে সুর মিলিয়ে গাওয়া , ”আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি—“ এই ছিল পূর্ব পাকিস্তান আমলে আমার শৈশব কৈশোরের কথা।

ডোমারের ফেলে আসা প্রাত্যহিক জীবন আমার সেই সব স্মৃতির আধার। দেশের উত্তরের এই সীমান্ত ঘেষা জনপদে একুশ আসতো ঘটা করে।তারপর চলে যেতো। কালো ব্যাজ কালো পতাকা, নগ্নপদ যাত্রার গুরুগম্ভীর গভীরতায় আমাদের সবার জীবন অতল তলে লালন করতো এক আনন্দ-বেদনার মিশ্র বোধ। শোক অহংকার প্রত্যয় মেশানো সে অনুভূতি কোমল প্রদীপের নরম শিখার আলোকমালার মতো মনের ভেতরে চির জাগরূক হোয়ে বেঁচে থাকতো। সে বয়সে একুশ আমাকে দিত গর্বের বোধ। একুশের ভাবনা ভরে রাখতো মনের আনাচে কানাচে। নিজেকে সেই আত্মত্যাগী, সাহসী শহীদ ভাইদের উত্তরাধিকারী ভাবতে ভালো লাগতো।

ডোমারে একুশের সন্ধ্যা আনতো একরকম শোক উৎসবের আমেজ। মাসের শুরু থেকেই চলতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের তোড় জোড়। তিনটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল আমাদের ডোমারে। “বাংলা নিকেতন”, “বাংলার মূখ” আর “গীতছন্দ”। যথাক্রমে মস্কোপন্থী, পিকিংপন্থী আর আওয়ামীপন্থী ।আমি প্রথমটিতে যুক্ত ছিলাম। তিনটিতে নিবিড় প্রতিযোগিতা হতো। তবে প্রভাত ফেরী হতো এক সঙ্গে। সন্ধ্যায় একুশের ছিল ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান। বাংলা নিকেতনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত বেশ উঁচু মানের। দ্বিতীয় মান ছিল বাংলার মূখ। রাজনৈতিক চেতনা বিধৃত সাংস্কৃতিক চর্চায় এই প্রতিষ্ঠানটিরও প্রশংসা করতে হয়। গীত ছন্দের প্রচেষ্টায় বাংলা সংস্কৃতির সাধারণ চর্চার চেষ্টা ফুটে উঠতো।

গ্রাম বাংলার এই সাংস্কৃতিক বাতাবরণ জীবনের প্রারম্ভ কাল থেকেই আমার আর আমার সাথীদের মাঝে জাগিয়ে রেখেছে রাজনীতি চেতনা আর সংস্কৃতি চর্চার সদা জাগরূক শুদ্ধ আলো। মনে পড়ে রঙিন আর্ট পেপারে নানা রঙের ঘন রং আর তূলি দিয়ে আমি অনুষ্ঠানের জন্য পোষ্টার লিখতাম। মঞ্চসজ্জা করতাম বিভিন্ন রাজনৈতিক থিমের ব্যাক ড্রপ সৃষ্টি করে। রুচি বিন্যাসের উচ্চতর স্তরে আমরা প্রতিযোগিতা করতাম। আমরা নিজেরাই অনুষ্ঠানের ধারা বর্ণনা লিখতাম। মঞ্চ নাটিকা লিখতাম, অভিনয় করতাম আর মঞ্চে পরিবেশন করতাম। এ পরিবেশনা গুলির মূলে থাকতো রাজনৈতিক চেতনার তথ্য-বার্তা। আমাদের তিনটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে তুমুল প্রতিযোগিতা হতো । কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া ডোমারের মানুষের মাঝে ঐ প্রতিযোগিতার জন্য ছিল প্রলম্বিত প্রতীক্ষা। আশ্চর্য রুচিশীলতায় সমৃদ্ধ ছিল তৃনমূল মানুষগুলির মনন ও জীবন।

অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ছোটকাল থেকে পরিচয় ঘটে আমাদের সংগ্রামী ইতিহাসের ঘটনা-রচনা ও চেতনাগুলির সাথে। রবীন্দ্র-নজরুল রচনা ছাড়াও পরিচয় ঘটে ডি,এল,রায়, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ক্লাসিক রচনাবলীর সাথে। সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচনার সাথেও গড়ে ওঠে সখ্য। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত “একুশে ফেব্রুয়ারী” সঙ্কলনটি হয়ে ওঠে আত্মার আত্মীয়। আব্দুল গনী হাজারী, সামসুর রাহমান হয়ে ওঠে আমাদের পথের দিশা। ঐ সঙ্কলনটি থেকে কবিতা আবৃত্তি করতাম আমরা। “ স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে

বন্ধু? ভয় কি বন্ধু খাড়া রয়েছি তো সাত কোটি পরিবার...”। একুশের প্রথম কবিতা, “ আজ আমি কাঁদতে আসিনি...।“ এছাড়াও আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠে ততকালিন প্রচলিত গণসঙ্গিত গুলি। সোবহানদার দৃঢ় ভঙ্গিতে দুলে দুলে গাওয়ার লিড আর কোরাসের জোরালো সমবেত পরিবেশনা ছিল শিহরন জাগানো। আমরা গাইতাম, “ ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়... ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় মোদের হাতে পায়...। কইমু না আর কইমু না অন্য কথা কইমুনা... অন্য কথা মোদের মুখে কেমনে শোভা পায়...” আমার শিরিন ভাবী অপূর্ব নৃত্য মুদ্রায় রণসঙ্গীতের তালে নাচতেন “কারার অই লৌহ কপাট...।“ “সৃষ্টি সুখের উল্লাসে...” ইত্যাদি। মঞ্চ কেঁপে কেঁপে উঠত।

আসাদুজ্জামান নুর ভাই তখন টিভি নাটকের নট হননি। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সংস্কৃতি বিভাগের পুরভাগে ছিলেন। তার জায়গা আমাদের তৎকালীন মহকুমা নীলফামারীতে ছাত্র ইউনিয়নের এক অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার জন্য আমন্ত্রন করেছিলেন বাংলা নিকেতনকে। আমরা ডোমার থেকে গিয়ে পাশের শহর নিলফামারীতে নুর ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান করেছিলাম। তিনি মঞ্চে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান তদারক করেছিলেন।

এর আগে চীনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সৈয়দপুর শাখার সম্মেলনেও আমরা আমন্ত্রিত হয়ে ডোমার থেকে এসে অনুষ্ঠান করেছিলাম।সেখানে মরতুজা ইন্সটিটিউটে তখন অতিথি হয়ে এসেছিলেন ততকালিন ছাত্রনেতা রাশেদ খান মেনন। এগুলি সবই পাকিস্তান আমলের একুশের কথা।

একুশ তাই আমাদের চেতনার মূলভাগে সতত জাগরুক। আমাদের আত্মপরিচয়ের তাগিদ সংস্কৃতি পরিমণ্ডলের আনন্দ–উৎসবের ভেতরে তা লালন করেছে। শোকের বেদনাকে শক্তি ও সৌন্দর্যে কর্ষিত করে আমাদের প্রস্তুত করেছে আত্মনিয়ন্ত্রনের রাজনৈতিক ফটকে পৌঁছে দিতে। তাই একদিন দেশের ডাক এলে, বিনা দ্বিধায় দেশ-ভালবাসার টানে সাথীদের সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মুক্তির সংগ্রামে। এই পরবাসে আজও সে ভালবাসা গর্বের সাথে আমার হৃদয়ে সযত্নে তা চিরকাল লালন করছি।

মেলবোর্ন ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫